بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৩ এপ্রিল, ২০২৬ মোতাবেক ০৩ শাহাদাত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

পৃথিবীতে তওহীদ (বা একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.)-এর ব্যাকুলতা, প্রচেষ্টা, সাহসিকতা আর শিরকের সকল দিক মোকাবিলায় এক সুদৃঢ় পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হওয়া এবং প্রত্যেক জাতির শিরককলুষিত চিন্তাধারা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে সত্য বলার বিষয়ে আমরা পূর্বেই পড়েছি। এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

চিন্তা করা প্রয়োজন যে, হাজারো বিপদ দেখা দেওয়া এবং বাধাদানকারী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী লাখো শত্রু মাথাচাড়া দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কত-না দৃঢ়তার সাথে তাঁর নবুওয়তের দাবিতে শুরু থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অবিচল ও অটল ছিলেন! বছরের পর বছর তিনি এমন সব বিপদাপদ দেখেছেন এবং এমন দুঃখকষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, যা সফলতা লাভের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করত আর প্রতিনিয়ত তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যেগুলো ধৈর্য ধরে সহ্য করার মাধ্যমে কোনো জাগতিক লক্ষ্য অর্জিত হবার কথা কল্পনাও করা যেত না। বরং নবুওয়তের দাবি করে নিজের পূর্বের সঙ্গীসাথিদেরও হারিয়ে বসেন। [অর্থাৎ নিজের হাতেই, নিজের পুরোনো দলকে এবং যাদের সাথে ঘনিষ্টতা ছিল– তাদের হারিয়ে বসেন।] একটি মাত্র কথা বলে তিনি লক্ষ বিভেদের জন্ম দিয়েছেন এবং হাজারো বিপদাপদ নিজের মাথায় টেনে এনেছেন। তিনি স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন, হত্যার জন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করা হয়, ঘরদোর ও উপায়-উপকরণ ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়, বারংবার বিষ প্রয়োগ করা হয়, হিতাকাঙ্ক্ষীরা অনিষ্টকামী হয়ে উঠে এবং যারা বন্ধু ছিল তারা শত্রুতা আরম্ভ করে; সুদীর্ঘকাল তাঁকে এমন সব তিক্ততা সইতে হয়েছিল, যার ওপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোনো প্রতারক বা ধোঁকাবাজের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, এছাড়া (তাঁর) সত্যবাদিতা ও স্পষ্টভাষিতা এমন ছিল যে, তওহীদের প্রচার করে তিনি সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এবং গোটা বিশ্বের শিরকে নিমজ্জিত সকল মানুষকে বিরোধী সারিতে দাঁড় করিয়েছেন; যারা আপনজন ও স্বজন ছিল– প্রতিমাপূজা করতে বারণ করার মাধ্যমে তাদেরকেই সর্বপ্রথম শত্রুতে পরিণত করেছেন। হরেক রকম সৃষ্টিপূজা, পীরপূজা এবং অপকর্ম করতে বারণ করে ইহুদীদের সাথেও সম্পর্ক নষ্ট করেন। হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং অপমান করতে বারণ করেন, যে কারণে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে; [অর্থাৎ, ইহুদীদেরকে ঈসার প্রতি মিথ্যারোপ করা থেকে বিরত থাকতে বলায় তাদের হৃদয়ে আগুন লেগে যায়] এবং তারা চরম শত্রুতার জন্য উঠেপড়ে লাগে, আর সবসময় তাঁকে হত্যা করার জন্য ওত পেতে থাকে। একইভাবে খ্রিষ্টানদেরও ক্ষেপিয়ে তোলেন, কারণ তাদের বিশ্বাস অনুসারে হযরত ঈসা (আ.)-কে তিনি খোদা বা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করেন নি, আর অন্যের পরিত্রাতা হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুবরণেও বিশ্বাস করেন নি। অগ্নিপূজক এবং তারকাপূজারীরাও রেগে যায়, কেননা তাদেরকেও তাদের দেবতাদের উপাসনা থেকে বিরত থাকতে বলা হয় এবং শুধুমাত্র

তওহীদকেই নাজাত বা পরিত্রাণের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়। তিনি (আ.) বলেন, এখন ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখার বিষয় হলো– এটিই কী জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির রীতি? সে যুগের লোকেরা আপত্তি করত, মহানবী (সা.) পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করেছিলেন। সকল শ্রেণির লোককে এমন সব স্পষ্ট ও মর্মপীড়াদায়ক কথা শোনানো হয়, ফলে সকলেই শত্রুতায় উঠেপড়ে লাগে এবং সবার মন ভেঙে যায়। আর নিজের দল এতটুকু ভারী হবার অথবা কারো আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সামান্য শক্তি অর্জিত হবার পূর্বেই সবাইকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তোলেন যে, তারা তাঁর রক্তপিপাসু শত্রু হয়ে যায়। আজও ইসলামবিরোধী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি এই অপবাদই আরোপ করে থাকে। কিন্তু এই অপবাদ আরোপ করার সময় তারা ভেবে দেখে না যে, কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ কি নিজের ওপর এমন বিপদ ডেকে আনে? তিনি (আ.) বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কৌশল তো এমন হবার কথা, যেভাবে কতককে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলেন, তেমনি কতককে সত্যবাদীও বলতেন; [অর্থাৎ যদি জগতের পেছন পেছনই চলার থাকত তাহলে যেভাবে কতককে মিথ্যাবাদী বলেছিলেন, তেমনি খুশি করার জন্য কতককে সত্যবাদীও বলা উচিত ছিল;] এর ফলে কেউ বিরোধী হলে আবার কেউ অনুকূলেও থাকত। সত্য কথা হলো, আরবদের যদি বলা হতো– তোমাদের লাত এবং উযযাই সত্য– তাহলে তারা তো সেই মুহূর্তেই তাঁর (সা.) চরণে লুটিয়ে পড়ত এবং তিনি তাদের দিয়ে যা ইচ্ছা করাতে পারতেন। কেননা তারা সবাই আপনজন ও আত্মীয়স্বজন ছিল আর জাতিগত আত্মভিমানে ছিল অতুলনীয়। অর্থাৎ তাদের সাথে আত্মীয়তা ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং গোত্রীয় সম্পর্ক ছিল, আর এজন্য তারা যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকত। সবকিছু তো তারা আগে থেকেই মানত, কেবল মূর্তিপূজার শিক্ষা দিলেই তারা আনন্দিত হয়ে যেত। [তিনি (সা.) যদি শুধু একথা বলে দিতেন যে, ঠিক আছে, তোমাদের মূর্তিগুলো সত্য– তবেই তারা খুশি হয়ে যেত এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর আনুগত্য বরণ করত। এই প্রস্তাবই তারা রেখেছিল।] কিন্তু ভেবে দেখা উচিত যে, মহানবী (সা.) কর্তৃক নিমিষেই আপন-পর সবার সাথেই সম্পর্ক নষ্ট করা এবং কেবল তওহীদকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যার চেয়ে অধিক ঘৃণ্য বস্তু সেই দিনগুলোতে জগতের বুকে আর কিছুই ছিল না এবং যার কারণে শত শত বিপদ ধেয়ে আসে, এমনকি প্রাণ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিল– তা কোন্ জাগতিক স্বার্থে করেছিলেন? অথচ এ কারণেই পূর্বে নিজের গোটা জগৎ এবং জনসমর্থন হাতছাড়া করেছিলেন, এরপরও সেই একই বিপদসঙ্কুল বিশ্বাসের ওপর অটল থাকার মাধ্যমে, যা প্রকাশ করামাত্রই নও-মুসলিমদের বন্দি হতে হয়, শিকলাবদ্ধ করা হয় এবং ভয়াবহ মার খেতে হয়– প্রশ্ন হলো, কোন্ স্বার্থ চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য ছিল? কেবল তিনি নিজেই নন, বরং তওহীদের ঘোষণা দেবার কারণে তাঁর (সা.) অনুসারীদেরকেও চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির কি এটিই রীতি যে, প্রত্যেককে তার স্বভাব, অভ্যাস, ইচ্ছা এবং বিশ্বাসের পরিপন্থী তিক্ত কথা শুনিয়ে নিমিষে নিজের প্রাণের শত্রু বানিয়ে বসেন, এমনকি দু-একটি সম্প্রদায়ের সাথেও কোনো সখ্যতা রাখেন নি? যেসব মানুষ লোভী এবং ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকে তারা কি এমন কৌশল অবলম্বন করে, যার ফলে বন্ধুরাও শত্রু হয়ে যায়? যারা কোনো ছলচাতুরীর মাধ্যমে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তাদের রীতি কি এমনটিই হয় যে, তারা একযোগে গোটা বিশ্বকে শত্রুতা আরম্ভ করার জন্য উসকে দেবে এবং নিজের প্রাণকে সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তার মুখে ঠেলে দেবে? তারা তো নিজেদের

স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবার সাথে আপসের পথ বেছে নেয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে সত্যতার সনদপত্র বিলিয়ে বেড়ায়। খোদার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হয় না আর খোদার একত্ববাদ এবং মাহাত্ম্য তাদের কাছে অগ্রগণ্য হয় না। এটি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই যে, তারা খোদার খাতিরে অযথা দুঃখকষ্ট ভোগ করে বেড়াবে। তারা তো শিকারির ন্যায় সেখানেই ফাঁদ পাতে যা শিকার ধরার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হয়ে থাকে। যদি ধরতেই হয়, ধোঁকা দিয়ে কাবু করতে হয়, তাহলে শিকারির মতো জাল বিছায় এবং সেই পন্থাই অবলম্বন করে যাতে পরিশ্রম কম হয়, কিন্তু জাগতিক লাভ অনেক বেশি হয়ে থাকে। কপটতা তাদের পেশা এবং তোষামোদ তাদের চরিত্র হয়ে থাকে। সবার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা এবং প্রত্যেক চোর ও সাধুর সাথে সমভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা তাদের এক বিশেষ নীতি হয়ে থাকে। মুসলমানের সাথে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' এবং হিন্দুদের সাথে 'রাম রাম' বলার জন্য তারা সদা প্রস্তুত থাকে এবং প্রত্যেক বৈঠকে 'হ্যাঁ' বলা হলে 'হ্যাঁ' আর 'না' বলা হলে 'না' বলে তাল মেলায়। অর্থাৎ যেমন বৈঠক হয়, তারা নিজেদের সেভাবেই মানিয়ে নেয়। খোদার সাথে তাদের কীসের সম্পর্ক আর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনেরই বা কী প্রয়োজন? আর নিজের প্রফুল্ল মন ও প্রাণকে বিনা কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের মুখে ঠেলে দেবার তাদের প্রয়োজনই বা কী? শিক্ষক তাদেরকে কেবল একটি পাঠ দেয় যে, সবাইকে একথাই বলা উচিত– তোমার পথই সঠিক, তোমার দৃষ্টিভঙ্গিই যথার্থ এবং তুমি যা বুঝেছ সেটিই সঠিক। মোটকথা, সরল-বক্র, সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের প্রতি তাদের কোনো দৃষ্টিই থাকে না; বরং যে তাদের একটু মিষ্টিমুখ করায়, তাদের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই সাধু, পবিত্র ও ভদ্রলোক বলে গণ্য হয়। আর যার প্রশংসা করলে তার সামান্যও পেট ভরে, তাকেই তারা মুক্তিপ্রাপ্ত, স্বর্গের উত্তরাধিকারী এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সেই ব্যক্তিই সবকিছু হয়ে যায়।

কিন্তু হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান হয় যে, মহানবী (সা.) কথা ও কাজের অভিন্নতায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, নির্মল অন্তরের অধিকারী এবং খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে উদ্যত, আর সৃষ্টির প্রতি আশাভরসা রাখা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন; যিনি খোদার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে এই কথার বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন নি যে, তওহীদের ঘোষণা দেবার কারণে আমার ওপর কী কী বিপদ নেমে আসবে এবং মুশরিকদের হাতে আমাকে কী কী দুঃখ ও যন্ত্রণা সইতে হবে। বরং সকল প্রকার কাঠিন্য, কঠোরতা এবং বিপদাপদকে নিজের ওপর বরণ করে নিয়ে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালন করেছেন। আর মুজাহাদা বা খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়ায এবং নসীহতের আবশ্যকীয় শর্তাবলির সবকটি দৃষ্টিপটে রেখেছেন এবং কোনো ভয় প্রদর্শনকারীকে এতটুকুও গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য সত্যই বলছি, নবীকূলের জীবনের ঘটনাবলিতে এমন সব ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার ওপর এরূপ ভরসা করে প্রকাশ্য শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না। নবীদের ইতিহাসেও দেখুন, এতটা দৃঢ়পদ থাকার দৃষ্টান্ত কোথাও প্রমাণিত নয়।

অতএব কিছুটা হলেও সততার সাথে চিন্তা করা উচিত, এই সমস্ত পরিস্থিতি কত পরিষ্কারভাবে মহানবী (সা.)-এর অভ্যন্তরীণ সত্যতার প্রমাণ বহন করে! এ ছাড়াও বুদ্ধিমান মানুষ যদি এসব অবস্থার প্রতি আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে

পারবে, মহানবী (সা.) যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি সময় ছিল যখনকার বিদ্যমান অবস্থা একজন মহান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ঐশী সংস্কারক এবং ঐশী পথপ্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল; আর যেসব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল তা-ও ছিল বাস্তবে সত্য ও অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ যুগ এতটাই বিকৃত ছিল যে, সেই সময় একজন পথপ্রদর্শক, একজন সংস্কারক এবং একজন নেতার প্রয়োজন ছিল আর তিনি সেই যুগে আগমন করেছেন; আর সেসকল শিক্ষার সমাহার ছিলেন যার দ্বারা সমসাময়িক যুগের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়। আবার সেই শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যা লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সঠিক পথের দিকে টেনে আনে এবং লক্ষ লক্ষ বক্ষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর অমোঘ চিহ্ন অঙ্কিত করে দেয়। নবুওয়তের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ মুক্তির মূলনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া– তাকে তিনি এমন পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন যা অন্য কোনো নবীর মাধ্যমে কোনো যুগে লাভ হয় নি। সুতরাং এসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অবলীলায় অন্তর থেকে এই সাক্ষ্য স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাসে উৎসারিত হবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে একজন সত্য পথপ্রদর্শক। যে ব্যক্তি গোঁড়ামি ও হঠকারিতাবশত অস্বীকারকারী হয়– তার রোগ তো দুরারোগ্য! সে চাইলে খোদা তা'লার প্রতিও বিমুখ হতে পারে; নতুবা সত্যতার সেসব নিদর্শন যা মহানবী (সা.)-এর মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে, অন্য কোনো নবীর মাঝে এর যে-কোনো একটিও কেউ প্রমাণ করে দেখাক, যেন আমরাও জানতে পারি।

অতঃপর তিনি বলেন, হিন্দুরা অন্য সকল নবী এবং কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে কেবল বেদের ভজন গেয়ে চলেছে যে, বেদই সবকিছু। খ্রিষ্টানরা সমস্ত ঐশী শিক্ষাকে ইঞ্জিলের মাঝেই সমাপ্ত-সীমাবদ্ধ করে বসে আছে; তারা এটা বোঝে না যে, প্রত্যেক কিতাবের মান ও মর্যাদা তওহীদের বিষয়ে এর হিতসাধনের নিরিখে পরিমাপ করা হয়। আর যে কিতাব তওহীদের শিক্ষা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যত অগ্রণী, মর্যাদায় সেটি তত উন্নত। ঐশী কিতাবের আসল সৌন্দর্য তাতে তওহীদের শিক্ষা কতটা বেশি রয়েছে তার নিরিখে বুঝা যাবে। আর এই কারণেই তওহীদের অস্বীকারকারী ব্যক্তি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার হলেও মুক্তি পেতে পারে না। অর্থাৎ, সকল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকলেও সে যদি তওহীদের অস্বীকারকারী হয় তবে আল্লাহ্‌র কাছে সে মুক্তিপ্রাপ্ত নয়। এখন এই ভদ্রলোকদের ভাবা উচিত, তওহীদ– যা মুক্তির মূলমন্ত্র– তা কোন্ কিতাবের মাধ্যমে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছে? কেউ আমাদের বলবে কি, কোন্ দেশে বেদের মাধ্যমে একত্ববাদ বিস্তার লাভ করেছে? এমন কোনো দেশ দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে ইঞ্জিলের মাধ্যমে তওহীদের প্রচার হয়েছে; বরং ইঞ্জিলের অনুসারীরা একত্ববাদীকে নাজাতপ্রাপ্তই মনে করে না। অর্থাৎ, যারা তওহীদে বিশ্বাসী তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্তই মনে করে না। পাদ্রিরা তওহীদে বিশ্বাসীদের এক অন্ধকার আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা তো একথাই বলে যে, যারা তওহীদে বিশ্বাসী, যারা কেবল এক খোদাকে মানে এবং তিন খোদাকে মানে না, তারা আগুনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যেখানে কেবল রোদন এবং দন্তপেষণ ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। আর তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই কালো আগুন থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই রক্ষা পাবে যে খোদার জন্য মৃত্যু, বিপদাপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, কষ্ট পাওয়া এবং দেহধারণ ও খোদার অন্য রূপধারণকে চিরকালের জন্য বৈধ মনে করে; অন্যথায় বাঁচার কোনো পথ নেই। [অর্থাৎ এতে যীশু খ্রিষ্টের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।] যেন সেই কাল্পনিক স্বর্গ ইউরোপের দুটি বড়ো জাতি ইংরেজ এবং রুশদের

মাঝে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে। এখন এতে আরো বড়ো বড়ো দেশও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আমেরিকার লোকেরাও বর্তমানে এমন কথা বলে থাকে, বরং এখন তো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষ থেকে এমন কথাও বলা আরম্ভ হয়েছে যে, মসীহ্‌র দ্বিতীয় আগমন হয়ত ট্রাম্পের বেশে হবে, ইন্না লিল্লাহ্। তিনি (আ.) বলেন, (স্বর্গ) অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে আর বাকি সকল একত্ববাদী– যারা খোদা তা'লাকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ উৎকর্ষের পরিপন্থী সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে– তাদেরকে এই অপরাধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে!

আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য হলো, আজ ধরাপৃষ্ঠে তওহীদ নামক বস্তুটি মহানবী (সা.)-এর উম্মত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাওয়া যায় না এবং পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিতাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম সম্মানের সাথে সেই সত্য খোদার পানে পথ দেখায়। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে; আর মুসলমানদের খোদা তিনিই যিনি অনাদিকাল থেকে অক্ষয়-অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় এবং স্বীয় শাশ্বত গুণাবলির ক্ষেত্রে তেমনই আছেন যেমনটি তিনি পূর্বে ছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা এমন, যেগুলোর দ্বারা ইসলামের পথপ্রদর্শকের নবুওয়তের সত্যতা সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। এটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এবং সূর্যের মতো ভাস্বর। কারণ নবুওয়তের অর্থ এবং রিসালত ও নবুওয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বরকতময় সত্তাতেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; অর্থাৎ এখান থেকেই সবকিছু প্রমাণিত হচ্ছে। আর যেভাবে শিল্পকর্ম দেখে শিল্পীকে চেনা যায়, ঠিক সেভাবেই বুদ্ধিমানরা বিদ্যমান সংস্কার কার্যাবলি দেখে সেই ঐশী সংস্কারককে শনাক্ত করছে। কোনো নির্মাণশিল্পিকে তার বানানো যন্ত্রাংশ বা জিনিসের মাধ্যমেই চেনা যায়, অর্থাৎ তার বানানো উন্নত মানের জিনিসের মাধ্যমে। ঠিক একইভাবে ঐশী সংস্কারকের পরিচয় হলো– তিনি তওহীদের প্রচারক হয়ে থাকেন।

অনুরূপভাবে আরো হাজার হাজার এমন ঘটনা রয়েছে যেগুলো দ্বারা মহানবী (সা.)-এর ঐশী সাহায্যপুষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন, এটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন অর্থহীন, শক্তিহীন, অসহায়, নিরক্ষর, এতিম, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র মানুষ এমন এক যুগে– যখন প্রত্যেক জাতির পূর্ণ আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তি ছিল– এমন জ্যোতির্ময় শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যে, আপন অকাট্য প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন? আর বড়ো বড়ো ব্যক্তিবর্গকে যারা জ্ঞানী সেজে বসে ছিল এবং দার্শনিক আখ্যায়িত হতো, তাদের স্পষ্ট ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন? আর নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও এমন শক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, বাদশাদের সিংহাসন থেকে ভূপাতিত করেছেন এবং সেসব সিংহাসনে দরিদ্রদের বসিয়েছেন? এটি যদি ঐশী সাহায্য না হয়ে থাকে, তবে আর কী ছিল? বুদ্ধি, জ্ঞান এবং শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয়ী হওয়া কি ঐশী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হতে পারে?

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ: ১০৮-১১৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইতিহাস স্পষ্টভাবে বলছে এবং কুরআন মজীদের অনেক স্থানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সারা বিশ্বে শিরক, পথভ্রষ্টতা এবং সৃষ্টিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সব মানুষ সত্যের মূলনীতি ত্যাগ করেছিল; সরল পথ ভুলে গিয়ে প্রত্যেক দল পৃথক

পৃথক বিদআত বা ভ্রান্ত পথের অনুসারী হয়েছিল। আরবে মূর্তিপূজার প্রবল প্রাধান্য ছিল, পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার গরম ছিল। [ইরানীরা সেই যুগে অগ্নিপূজারী ছিল, তারা আগুনের পূজা করত।] হিন্দুস্তানে মূর্তিপূজা ছাড়াও আরো শত শত প্রকারের সৃষ্টিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই দিনগুলোতেই এমন অনেক পুরাণ ও পুস্তক রচিত হয়েছিল যার মাধ্যমে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছিল এবং অবতারপূজার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আর পাদ্রি ওয়ার্ড (Ward)-এর [ওয়ার্ড লেখা হলেও এর দ্বারা তিনি জন ড্যাভেনপোর্টকে বুঝিয়েছেন] এবং আরো অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের মতে সেই দিনগুলোতে খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। [জন ড্যাভেনপোর্টও এটি লিখেছেন এবং অন্যরাও লিখেছেন; তাঁর যুগে এই কথাগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, আর খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ এবং বিজ্ঞ ইংরেজগণ একথা লিখেছেন যে, খ্রিষ্টধর্মের মতো এতটা ভ্রষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না।] আর পাদ্রিদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে খ্রিষ্টধর্মে এক কঠিন কলঙ্কতিলক লেগে গিয়েছিল এবং খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে একটি-দুটি নয়, বরং অনেক বিষয় খোদার আসন দখল করে নিয়েছিল।

অতএব, এমন সার্বজনীন ভ্রষ্টতার সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেরিত হওয়া, যখন সমসাময়িক যুগে বিরাজমান অবস্থা এক মহান চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবং ঐশী হিদায়াতের যারপরনাই প্রয়োজন ছিল, তখন তাঁর আবির্ভূত হয়ে বিশ্বকে তওহীদ ও সৎকর্ম দ্বারা আলোকিত করা এবং শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা, যা সকল অনিষ্টের মূল– তা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল এবং সকল রসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর (আ.) সত্য হওয়া এ থেকেই প্রমাণিত যে, সেই সর্বগ্রাসী ভ্রষ্টতার যুগে প্রকৃতির বিধান একজন মহান পথপ্রদর্শকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবং ঐশী সুন্নত একজন সত্যনিষ্ঠ পথনির্দেশকের দাবি করছিল। [সুন্নতও এটিই ছিল যে, যখন মানুষ বিপথগামী হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রেরিতদের পাঠান।] কেননা আদিকাল থেকেই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার বিধান হলো, যখন পৃথিবীতে কোনো প্রকার কঠোরতা ও দুর্ভোগ এর চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ঐশী কৃপা তা দূর করার দিকে দৃষ্টি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন অনাবৃষ্টির কারণে চরম পর্যায়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৃষ্টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে, মানুষ মরতে শুরু করে, তখন অবশেষে দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যখন মহামারীর কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরতে শুরু করে তখন কোনো না কোনোভাবে বাতাসের বিশুদ্ধতার কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায় অথবা কোনো ঔষধই আবিষ্কার হয়ে যায়। এবং যখন কোনো জাতি কোনো অত্যাচারীর কবলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন শেষ পর্যন্ত কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও মুক্তিদাতা দৃশ্যপটে আসে। অনুরূপভাবে যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পথ ভুলে যায় এবং তওহীদ ও সত্যের উপাসনা পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে কোনো বান্দাকে পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং নিজ বাণী ও ওহী দ্বারা সম্মানিত করে আদমসন্তানের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন, যেন যতটুকু বিকৃতি দেখা দিয়েছে তার সংস্কার হয়। এর পেছনে মূল তত্ত্বকথা হলো, বিশ্বের স্থিতি ও স্থায়ীত্ব বিধানকারী প্রতিপালক-প্রভু– যিনি সমগ্র জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল– তিনি সৃষ্টির কল্যাণসাধনের কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না এবং একে অকেজো ও অর্থহীন হিসেবে পরিত্যগ করেন না;

বরং তাঁর প্রতিটি গুণ স্বীয় সময়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়। অতএব যখন যৌক্তিক দিক থেকে একথা সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক বিপদের আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সেই গুণ প্রকাশিত হয় যা এর মোকাবেলায় থাকে; এ বিষয়টি ইতিহাস এবং বিরোধীদের স্বীকারোক্তি থেকে আর বিশেষভাবে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময়ে এই বিপদ এতটা আধিপত্য বিস্তার করছিল যে, পৃথিবীর সকল জাতি তওহীদ, একনিষ্ঠতা ও সত্যপ্রীতির সরল পথ পরিত্যাগ করেছিল এবং এটিও প্রত্যেকের জানা আছে যে, সমসাময়িক নৈরাজ্যের চিকিৎসক ও জগতকে শিরক ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা থেকে বের করে তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠাকারী কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই ছিলেন, অন্য কেউ নয়; অতএব, এই ভূমিকার মাধ্যমে সহজাত ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য পথপ্রদর্শক।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০১, পৃ: ১১২-১১৪, টীকা নম্বর: ১০)

সুতরাং মহানবী (সা.)-ই হলেন সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহানবী (সা.) কীভাবে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন– আমি এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বিগত খুতবাগুলোতে বর্ণনা করেছি।

অতঃপর আমরা এ যুগে দেখি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর [তথা মহানবী (সা.)-এর] প্রকৃত প্রেমিককে তওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, কারণ এই যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, তিনি তাঁর (সা.) শিক্ষা ও সুন্নতের এক বাস্তব নমুনা ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় তাঁর নেতার পদাঙ্ক অনুসরণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদ প্রচারের এক গভীর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিল।

অতএব আমরা তাঁর রচনাবলি ও তাঁর বাস্তব জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যার মধ্যে আমি কয়েকটি উল্লেখ করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারও বড়ো অদ্ভুত। আমাদের ইলহাম اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ -একটি নতুন ধরনের ইলহাম। এর আগে কোনো ঐশীবাণীতে আমি এমন শব্দ দেখি নি। আমার মনে এর যে অর্থটি আসে তা হলো, এমন ব্যক্তি তওহীদের পর্যায়ের লোক হয়ে থাকেন, যারা এমন এক যুগে আদিষ্ট হন যখন পৃথিবীতে খোদার তওহীদের চরম অবমাননা হয় এবং একে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এমন সময়ে আগমনকারী ব্যক্তি তওহীদের মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকেন।

(মলফূযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ: ০১, সংস্করণ: ২০২২)

একথা তিনি একটি মজলিসে বর্ণনা করেছিলেন যা একটি পত্রিকা সংরক্ষণ করেছে। আরেকটি পত্রিকা **'আল-বদর'** সামান্য বিস্তারিতভাবে লিখেছে:

প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে তওহীদের এমন পিপাসা জাগ্রত করা হয় যে, তিনি তার ব্যক্তিগত সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একপাশে রেখে তওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বয়ং মূর্তিমান তওহীদ হয়ে যান। তাঁর ওঠা-বসা, চলাফেরা, গতি-স্থিতি বরং প্রতিটি কথা ও কাজে গভীর তওহীদপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়।

(আল-বদর, ২য় খণ্ড, সংখ্যা: ১২, তারিখ: ১০ই এপ্রিল ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১, কলাম নম্বর ২)

তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি উদ্দেশ্য ও পরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে, কিন্তু সেই ব্যক্তির– অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিমগ্ন– তাঁর

লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা হলো একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদ। তিনি তাঁর স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি ও উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদকে স্থান দেন, নিজের সকল চাহিদাকে উপেক্ষা করেন। একইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি প্রতিমা থাকে; সে উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়, কিন্তু সেই পর্যন্ত তাকে পৌঁছানো বা এর পূর্বেই তার আয়ুর সমাপ্তি ঘটানো আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে থাকে। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য মানুষের বড়ো আকাঙ্ক্ষা থাকে– ব্যবসায়ীদের, বাণিজ্যিক পেশার মানুষের এবং জাগতিক উদ্দেশ্য অন্বেষণকারীদের। তারা নিজস্ব একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু হয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে (লক্ষ্যে) পৌঁছে দেন অথবা তার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটে। সে তার সম্পদ, মানসম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য ছটফট করে ও আত্মহারা হয়ে যায়, এমনকি অনেক সময় মানুষ এসব সমস্যায় পড়ে আত্মহত্যাও করে ফেলে। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে মামুর (তথা প্রত্যাদিষ্ট) হয়ে আসেন, তাঁর এই আবেগ-উদ্দীপনা খোদা তা'লার তওহীদের জন্য হয়ে যায় এবং নিজের মানবিক কামনা-বাসনার পরিবর্তে খোদা তা'লার তওহীদের জন্য তিনি ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে যান।

তিনি (আ.) বলেন, আমি মনে করি, এমন সময়ে এই শব্দগুলো খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে– اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَ تَفْرِيْدِيْ (অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার তওহীদ ও একত্ববাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত)। কারণ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর তওহীদকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। এই তওহীদের খাতিরেই আল্লাহ্ তা'লা কখনো মহামারি, কখনো দুর্ভিক্ষ এবং কখনো তাঁর প্রিয় নবীদের হাতের তরবারির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার মুশরিক প্রাণকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারার পরিস্থিতিও কেবল এরই খাতিরে জটিল রূপ ধারণ করেছিল। মূসা (আ.)-এর বিষয়টিও এই তওহীদের জন্যই ছিল।

(মলফূযাত, খণ্ড: ০৫, পৃ: ০১-০২, সংস্করণ: ২০২২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিরক এবং এর সূক্ষ্ম প্রকারভেদসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

সকল ধরনের শিরক বর্জন করা উচিত। সূর্য, চাঁদ, আকাশের নক্ষত্র, বাতাস, আগুন, পানি বা অন্য কোনো পার্থিব জিনিসকে যেন উপাস্য সাব্যস্ত করা না হয়; আর জাগতিক উপায়-উপকরণকে যেন এমন মর্যাদা না দেওয়া হয় এবং সেগুলোর ওপর এমন ভরসা না করা হয় যার ফলে তারা খোদার শরীক হয়ে যায়; অধিকন্তু নিজের সংকল্প ও চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে যেন কিছু মনে করা না হয়, কেননা এটিও শিরকের প্রকারভেদের মধ্যে একটি। বরং সবকিছু করেও এটিই মনে করা উচিত যে, আমরা কিছুই করি নি। আর নিজের জ্ঞান নিয়ে কোনো অহংকার এবং নিজের আমল সম্বন্ধে কোনো গর্ব করা উচিত নয়, বরং নিজেকে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ও অথর্ব মনে করা উচিত, আর আত্মা যেন সার্বক্ষণিকভাবে খোদা তা'লার চৌকাঠে সিজদাবনত থাকে। অর্থাৎ, সবকিছু করার পরেও আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত থেকে নিবেদন করো যে, হে আল্লাহ্! তোমার অনুগ্রহের ফলেই সবকিছু হবে, সমস্ত ফলাফল সৃষ্টি হবে। মানুষের জ্ঞান কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী আর সীমাবদ্ধও। মানুষের জ্ঞান কোনো পাঠ দানকারীর মুখাপেক্ষী আর Limited অর্থাৎ সীমিত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান কোনো পাঠ দানকারীর মুখাপেক্ষী নয় এবং তা সত্ত্বেও অসীম; এর কোনো সীমা নেই। মানুষের শ্রবণশক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ। মানুষের শ্রবণ করার যে শক্তি তা বাতাসের মাধ্যম

চায় এবং তারপরও তা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শুনতে পারে। কিন্তু খোদার শ্রবণশক্তি তাঁর নিজস্ব শক্তিবলে কাজ করে এবং তা অসীম। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্য বা অন্য কোনো আলোর মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু খোদার দৃষ্টিশক্তি তাঁর নিজস্ব আলোতে এবং তা অসীম। তেমনই মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী, সময়ের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু খোদার সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষীও নয় এবং কোনো সময়েরও মুখাপেক্ষী নয় আর তা অসীম। কারণ তাঁর সমস্ত গুণাবলি অনন্য ও অতুলনীয়। তাঁর যেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তেমনই তাঁর গুণেরও কোনো দৃষ্টান্ত নেই। যদি একটি গুণে তিনি অপূর্ণ হতেন তবে সমস্ত গুণেই অপূর্ণ হতেন, তাই তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর সত্তার মতো তাঁর সমস্ত গুণাবলিতেও অতুলনীয় হন। এটিই সেই তওহীদ যা কুরআন শরীফ শিখিয়েছে, যা ঈমানের মূল ভিত্তি।

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ: ১৫৪-১৫৫)

বর্তমান যুগের প্রভাবে অনেক সময় শিশুদের মনেও এই প্রশ্ন ওঠে এবং তারা লিখে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ্ তা'লা কোথা থেকে এলেন? হয়ত বড়োরা তাদের এসব বলে অথবা নিজের থেকেই তাদের মনে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন আর তিনি অসীম। তাই তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। স্বয়ম্ভূ কোনো সত্তার যে চূড়ান্ত ধারণা আমরা কল্পনা করতে পারি, আল্লাহ তা'লাই তার সার্থক রূপ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রাখতে হবে, প্রকৃত তওহীদ যার স্বীকারোক্তি খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার স্বীকৃতির মাঝেই মুক্তি নিহিত তা হলো, খোদা তা'লাকে সত্তাগত দিক থেকে সকল ধরনের শিরক থেকে পবিত্র মনে করা– তা মূর্তিই হোক, মানুষই হোক, সূর্য হোক বা চন্দ্রই হোক, অথবা নিজের নফস অথবা নিজের কৌশল ও প্রতারণাই হোক না কেন। তাঁর বিপরীতে কাউকে সর্বশক্তিমান, রিযিকদাতা, সম্মানদাতা বা লাঞ্ছিতকারী জ্ঞান না করা, কাউকে সাহায্যকারী আখ্যা না দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নিজের ভালোবাসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ইবাদত শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের বিনয়কে শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের আশা-ভরসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ভয় শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা।

অতএব এই তিন প্রকারের বিশেষত্ব ব্যতীত কোনো তওহীদই পরিপূর্ণ হতে পারে না–**প্রথমত,** সত্তার দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের বিপরীতে সমস্ত সৃষ্টিকে বিলুপ্তপ্রায় অর্থাৎ লয়শীল মনে করা, আর সবকিছুকে সত্তাগতভাবে লয়শীল ও ভিত্তিহীন মনে করা। সব জিনিসই নিজ সত্তায় লয়শীল ও মিথ্যা; পরিপূর্ণ নয়। **দ্বিতীয়ত,** গুণাবলির দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ প্রতিপালনের ও উপাস্য হবার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া আর কারো প্রতি আরোপ না করা। আর বাহ্যিকভাবে যাদের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিপালন চোখে পড়ে, যাদের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়, মানুষ তাদেরকেও প্রতিপালক মনে করে; তাদেরকেও আল্লাহ্‌র হাতেরই একটি ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করা। [আমেরিকা কিছু নয়, ইসরাঈল কিছু নয়, দুনিয়ার আর কোনো বড়ো শক্তি কিছু নয়; বরং সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই। মুসলমানরাও যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, তবে নিশ্চয় তারা সফল হবে।] **তৃতীয়ত,** নিজের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতার দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ ভালোবাসা ও অন্যান্য বন্দেগিমূলক বিষয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ্ তা'লার অংশীদার গণ্য না

করা এবং তাঁর মাঝেই বিলীন হয়ে যাওয়া। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা উচিত, সেভাবে অন্য কাউকে না ভালোবাসা।

(খ্রিষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১২, পৃ: ৩৪৯-৩৫০)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, এখন এই যুগে যখন আল্লাহ্ দেখলেন যে, পৃথিবী বিকৃতির শিকার, কোটি কোটি সৃষ্টি শিরকের পথ বেছে নিয়েছে এবং চল্লিশ কোটির অধিক লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, যারা এক অধম মানুষ মরিয়মের পুত্রকে উপাস্য বানিয়ে বসেছে। [সেই যুগে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটি।] আর এর সাথে মদ্যপান, লাগামহীনতা, দুনিয়াপ্রীতি ও উদাসীন জীবনযাপন চরম রূপ ধারণ করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন যেন আমি এই সকল অনিষ্টের সংশোধন করি। এখন পর্যন্ত আমার হাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ পাপ, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অপকর্ম থেকে তওবা করেছে। [এ সংখ্যা সেসময়ের যখন তিনি একথা বলেছিলেন। এখন তো আল্লাহ্র অনুগ্রহে কোটি কোটি মানুষ তাঁর জামা'তে যোগদান করেছে।] আর তিনি (আ.) নিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেছেন যে, দেড়শরও বেশি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, যার সাক্ষী এই দেশের কয়েক লক্ষ মানুষ।

আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি পৃথিবীতে পুনরায় তওহীদ প্রতিষ্ঠা করি এবং মানবপূজা বা পাথরপূজা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র দিকে তাদের ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যেন অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি।

আমি দেখছি, মানুষের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে তওবা করে চলেছে। আর আকাশ থেকে এমন বাতাসও প্রবাহিত হচ্ছে যে, এখন প্রকৃতিগুলো তওহীদের অনুকূলে ধাবিত হচ্ছে এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, তিনি মানবপূজা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য শত শত মাধ্যম সৃষ্টি করা হয়েছে।

(মাকতুবাতে আহমদ, খণ্ড: ০১, পৃ: ২৫৬-২৫৭, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও সেগুলো প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমরা তবলীগও করি। আর প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো তওহীদ প্রসারের জন্য চেষ্টা করা।

তিনি (আ.) বলেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয়, প্রতিমাপূজার সংজ্ঞা কী এবং তাদেরকে কোন্ বিষয়টি প্রতিমাপূজারী বানিয়ে থাকে; আমাদের জন্য এর উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

জেনে রাখা উচিত যে, ইবাদত হলো বিশ্বাসের ফলাফল এবং সত্যবাদীদের বিশ্বাস হলো, খোদা এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র গুণাবলি অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ তাঁর গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নেই, [কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া সম্ভব নয়;] আর কোনো সূচনা নেই এবং সমাপ্তিও নেই। সত্য ও প্রকৃত খোদা অনাদি ও অনন্ত; তিনি কোনো সৃষ্টি নন যে জন্মগ্রহণ করবেন, অর্থাৎ কোনো পদ্ধতিতে জন্ম নেবেন। [যেমনটি আমি পূর্বে (অনেকের প্রশ্নের কথা) বলেছি, তাদের অনেকের প্রশ্নের উত্তর এতে এসে গেছে যে, সত্য ও প্রকৃত খোদা অনাদি ও অনন্ত, তিনি কোনো সৃষ্টি নন যে জন্মগ্রহণ করবেন; তিনি জন্ম নেন নি।] আর তিনি এমন বৈশিষ্ট্যাবলির ঊর্ধ্বে যেগুলো স্বীকার করতে আমাদের হৃদয় ঘৃণা করে। তাঁর গুণাবলি তো আমাদের হৃদয়ের স্বীকারোক্তি আর আমাদের হৃদয় তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে পরিচিত। তিনি আদি থেকে এক-অদ্বিতীয়।

কোন্ সে হৃদয় আছে যা তাঁর একত্ববাদের অস্বীকারকারী? আদিকাল থেকেই তিনি এক-অদ্বিতীয়। আর কোন্ সে হৃদয় যা তাঁর সম্পর্কে ত্রিত্ববাদকে স্বীকার করে?

(মাকতুবাতে আহমদ, খণ্ডঃ ০৫, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০)

[খ্রিষ্টানদের শিক্ষা হলো খোদা তিন। সৎ প্রকৃতির কেউ ত্রিত্ববাদ স্বীকার করতে পারে না।] তিনি (আ.) বলেন, আমি ত্রিত্ববাদের কলুষতার সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছি। খ্রিষ্টধর্মে যে ত্রুটিবিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে তার সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। একারণে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য, অর্থাৎ পৃথিবীতে চল্লিশ কোটির বেশি এমন মানুষ বিদ্যমান যারা হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বলে বিশ্বাস করে– আমার অন্তরে এতটাই আঘাত হেনেছে যে, আমার মনে হয় না, আমার সারা জীবনে এর চেয়ে বড়ো কোনো দুঃখের আমি সম্মুখীন হয়েছি। বরং যদি দুঃখ ও কষ্টে মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য সম্ভব হতো তাহলে এই দুঃখ আমাকে ধ্বংস করে দিত যে, কেন তারা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করে এক অসহায় মানুষের উপাসনা করছে! আর এরা কেন সেই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না যিনি সত্য ধর্ম ও সঠিক পথ সহকারে জগতে আগমন করেছেন; অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি কেন ঈমান আনে না? সবসময় আমার এই শঙ্কা হতো যে, এই দুঃখের কারণে আমি না আবার ধ্বংস হয়ে যাই! তিনি বলেন, খোদা কুরআন করীমে সত্য বলেছেন যে, এই মিথ্যার কারণে আকাশ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয়, অর্থাৎ একজন অসহায় মানুষকে খোদা বানানোর কারণে।

আর এই বেদনায় আমার অবস্থা হলো, অন্য লোকেরা যদি বেহেশত চায় তবে আমার বেহেশত হলো– আমি আমার জীবদ্দশায় মানুষকে এই শিরক থেকে মুক্তি পেতে এবং খোদার মহিমা প্রকাশিত হতে দেখে যাই। আর আমার আত্মা সব সময় এই দোয়া করে যে, হে খোদা! আমি যদি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকি এবং তোমার কৃপার ছায়া যদি আমার সাথে থাকে, তবে আমাকে সেই দিনটি দেখাও যেদিন হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মাথা থেকে এই অপবাদ তুলে নেওয়া হবে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, তিনি খোদা হবার দাবি করেছিলেন। একটি দীর্ঘকাল এমন কেটেছে যখন থেকে আমার পাঁচ বেলার নামাযের দোয়া এটিই যে, খোদা তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন এবং তারা তাঁর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করুক এবং তাঁর রসূলকে শনাক্ত করুক এবং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস থেকে তওবা করুক।

(মজমুআ ইশতেহারাত, খণ্ডঃ ০২, পৃঃ ৫৪৭-৫৪৮, নব সংস্করণ)

খ্রিষ্টধর্ম তো কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ত্রিত্ববাদের দর্শন শুধু কেতাবি দর্শন হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষত ইউরোপে এর অনুশীলনকারী খুব কমই রয়ে গেছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এখনো রয়েছে। কিন্তু যারা ত্রিত্ববাদের দর্শন পরিত্যাগ করছে তারাও এক খোদার বিশ্বাস রাখে না।

তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যতটুকু সাধ্য রয়েছে চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন– যে লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন এবং যে তওহীদের মহানবী (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে প্রকৃত তওহীদে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত হই আর জগতে এর বিস্তারকারী যেন আমরা হতে পারি। এখন মানবজাতির স্থায়ীত্বের এটিই একটি নিশ্চয়তা, এছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি দুই জনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

এক জন হলেন, মুকাররম খাজা জাফর আহমদ সাহেব, যিনি শিয়ালকোট জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি আমেরিকায় বসবাস করছিলেন; সম্প্রতি ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন।

তার কন্যা হাফসা হাই বলেন, শৈশব থেকে আমরা তাকে জামা'তের সেবায় নিষ্ঠা, বিনয় এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে দেখেছি। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক তার ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তার সন্তানাদি ও স্ত্রীর হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; আর এটি বস্তুনিষ্ঠ একটি মন্তব্য। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনকাল থেকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তার সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি কায়েদ হিসেবে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ হিসেবে, স্থানীয় কায়েদ হিসেবে, স্থানীয় আমীর হিসেবে, জেলা আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল আর কেন্দ্র থেকে যে-সব প্রতিনিধিদল যেত, তিনি সর্বদা নিজ বাড়িতে রেখে তাদের যত্নআত্তি করতেন। কখনো কোনো কর্মকর্তা সম্পর্কে অসংলগ্ন কথা তিনি নিজেও বলেন নি আর কখনো শুনাও পছন্দ করতেন না। তিনি কখনো তার সামনে সমালোচনার সুযোগ দিতেন না। আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। যে-কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে– তা জামা'তী সেবার বিষয়ে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে হোক– সর্বদা পরিপূর্ণ মনোযোগ দোয়ার দিকে দিতেন, আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। তার কন্যা বলেন, আমরাও দেখেছি, অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ সাহায্য করেছেন এবং তার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি তার অসুস্থ মায়েরও অনেক সেবাযত্ন করেছেন। অত্যন্ত ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে কয়েক বছর তার সেবা করেছেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং পৌত্রও আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।

অনুরূপভাবে তিনি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যেহেতু জেলা আমীর ছিলেন তাই সব জামা'ত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের ছোটো ছোটো জামা'ত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন আর সমস্ত পথ চিনতেন। জেলার অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি রাখতেন। এমনটি নয় যে, কেবলমাত্র আমীরের পদে আসীন ছিলেন এবং শহরে বসে থাকতেন, বরং সর্বত্র যাতায়াত করতেন। আর যখন সেখানে পরিস্থিতি ভালো ছিল তখন শিয়ালকোট থেকেও (রাবওয়ার) জলসা সালানায় বিশেষ ট্রেন আসত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে। তিনি তখন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এর ব্যবস্থা করতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং যেমনটি আমি বলেছি, সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অধিকারী ছিলেন, খুবই বিনয়ী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুকাররম উদ্রাগো হালিদো (Ouedraogo Halidou) সাহেবের। তিনি বুরকিনা ফাসোর স্থানীয় আহমদী সদস্য ছিলেন। সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ছিলেন আর বর্তমানে আইউগিয়ার একটি গ্রামে দায়িত্বরত ছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল; সেখানে ৩ মার্চ ডিউটিরত অবস্থায় সন্ত্রাসীদের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়, তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বয়স ছিল ৪০ বছর।

একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর তার স্ত্রী তার পরিবারের একমাত্র আহমদী সদস্য। অর্থাৎ তিনি ও তার স্ত্রী কেবলমাত্র আহমদী; তার পরিবারে আর কোনো আহমদী সদস্য নাই।

আঞ্চলিক মুবাল্লেগ সা'দাত সাহেব বলেন, মরহুম জামা'তের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং জামা'ত ও খিলাফতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত পুণ্যবান, ইবাদতগুজার ও নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক ছিলেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগ্রহের সাথে অংশ নিতেন। সেনাবাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতি বছর বুরকিনা ফাসোর জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করতেন। মুয়াল্লেম এবং মুরব্বী সাহেবদের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার আচরণ করতেন এবং তাদের বিভিন্ন সহযোগিতাও করতেন। ২০০৮ সালে আমি যখন ঘানা সফরে যাই; যদিও ২০০৫ সালে বুরকিনা ফাসোও গিয়েছিলাম; ২০০৮ সালে ঘানার সফরকালে সেখানে বুরকিনা ফাসোর খোদ্দামের একটি কাফেলা সাইকেলে করে আসে। তারা এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিল। আর তাদের সাইকেলগুলোও আমাদের এখানকার মতো উন্নত ছিল না। ভাঙাচোরা সাইকেল, খারাপ রাস্তা; এরই মাঝে তারা এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছিল। তারা ঘানায় পৌঁছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা সবসময়ই জলসা সালানায় সাইকেলে করেই যেতেন।

স্থানীয় মিশনারী সাম্পুরি আবদুর রহমান (Simpore Abdoul Rehman) সাহেব বলেন, তিনি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন এবং আমরা সর্বদা তাকে সেবার জন্য প্রস্তুত পেয়েছি। কোনো কাজের জন্য ডাকা হলে সাথে সাথে 'লাব্বাইক' বলতেন। জলসা সালানা ও অন্যান্য সাংগঠনিক ইজতেমায় অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি তার কাজের প্রতি এতটা নিবেদিত ছিলেন যে, লোকেরা তাকে ছোটো মুয়াল্লেম হিসেবে ডাকতেন। অনেক মুয়াল্লেমও ওয়াকফের চেতনায় ততটা কাজ করেন না যতটা তিনি করতেন। যতদিন তার সেনাবাহিনীতে চাকরি হয় নি ততদিন তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, আমার কোনো কাজ নেই, আমি গরিব; আমি কীভাবে জামা'তের উন্নতিতে অংশ নিতে পারি? কিন্তু যখন তার চাকরি হলো, তখন নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান শুরু করেন। জামা'তের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। যেখানেই তার বদলি হতো, সেখানেই প্রথমে তিনি জামা'তের সেন্টার বা মসজিদ খুঁজে বের করতেন এবং নিয়মিত জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণ করতেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে মাতা, স্ত্রী ছাড়াও একজন পুত্র এবং দুইজন কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০২৬, পৃ: ০২-০৮)